Vol. 2 | No. 2 | 1958

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ঊনিশ শতকের সাহিত্যপত্র ও মুসলিম-মানস

Volume	2
Issue	2
Year	1958
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	কাজী আবদুল মান্নান
Published online	December 16, 1958
DOI	10.62328/sp.v2i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v2i2.2
Pages	51-88
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

ঊনিশ শতকের সাহিত্যপত্র ও মুসলিম-মানস

Check for updates

কাজী আবদুল মান্নান

ঊনবিংশ শতাব্দীর 'সংবাদ প্রভাকর' থেকে আজকের 'নতুন সাহিত্য' বা 'সমকাল' পত্রিকাই যে আধুনিক বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান বাহন এ সম্পর্কে বোধকরি এখন তর্কের অবকাশ নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী মুসলমান, বিশেষকরে শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানরাও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে সাহিত্যের বিকাশ ছাড়া সমাজ জাগে না, আর সাহিত্য সৃষ্টির জন্য দরকার হয় পত্রিকা। তাঁদের এ সচেতনতার ফল হিসেবেই ইসলাম প্রচারক, প্রচারক, মিহির, হাফেজ, কোহিনুর, হিতকরী, নুর-অল-ইমান প্রভৃতি পত্রিকা এককালে দেখা দিয়েছিল, সমাজ মানসে জাগিয়েছিল আলোড়ন, সৃষ্টি করেছিল আমাদের আজকের সাহিত্যের ঐতিহ্য। হাফেজের প্রথম সম্পাদকীয়তে লেখা হয়—"আমাদের মুসলমান ভ্রাতাগণ হাফেজ প্রাপ্ত হইয়া জাতীয় গৌরবের চিহ্ন মনে করিয়া প্রতিপ্রফুল্ল মনে ইহার উন্নতি সাধনে চেষ্টা করিবেন বলিয়া আমাদের বেশ বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তাই আমরা, আজ এই দুর্দ্দিনে হাফেজ বাহির করিয়া মুসলমান ভ্রাতাগণের হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম। সকলে মিলিয়া সামাজিক কার্য্য মনে করিয়া হাফেজের উন্নতি সাধনে যত্নবান হইবেন; ইহাই একান্ত অনুরোধ।" কোহিনুর প্রকাশের পর গ্রাহক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সম্পাদকের এক আবেদন-পত্রে বলা হয়—"নানা কারণে সাহিত্যচর্চ্চা বিষয়ে বঙ্গীয় মোসলেম সমাজের ঘোর অবনতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সমাজের দুর্গতি-স্রোত অবরোধ না করিতে পারিলে জাতীয় উন্নতি সম্ভবে না। আবার নূতন নূতন পত্রিকার প্রচার ভিন্ন সমাজের অবনতিস্রোত অবরোধ সুদূর পরাহত। স্বার্থ-পরতা এবং একতাহীনতাই সমাজের সাহিত্যিক দুর্গতির মূলীভূত কারণ। আবার সাহিত্যিক দুর্গতিই আমাদিগকে অবনতির দিকে লইয়া যাইতেছে। এইরূপে

মোসলেম সমাজের মূলে অলক্ষিতে কুঠারাঘাত হইতেছে। জাতীয় উন্নতি সাহিত্যের প্রচার সাপেক্ষ। তাই করুণাময়ের করুণাকণার উপর নির্ভর করিয়া "কোহিনুর" পরিচালিত হইতেছে।" নুর-অল-ইমান পত্রিকার প্রথম সংখ্যার বিজ্ঞাপনে বলা হয়—"বিদ্যানুরাগী ইংরেজ রাজপুরুষদিগের স্থাপিত 'এসিয়াটিক সোসাইটি' সমাজের কিছু সাদৃশ্যে উত্তর-বঙ্গে কয়েক বৎসর হইল নুর-অল-ইমান সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। ধর্ম্ম, সমাজ ও বিদ্যাবিষয়ক কথা বঙ্গীয় মুসলমানের ঘরে ঘরে প্রচার করা এই সভার উদ্দেশ্য। করুণাময় খোদাতালার করুণার উপর নির্ভর করিয়া অধুনা এ সমাজের মেম্বরগণ এই কাগজখানি বাহির করিতে হেম্মত বাঁধিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশের মুসলমানগণ মূল্য দিয়া পুস্তক বা কাগজ পড়িতে অদ্যবধি শিখেন নাই; এজন্য এ কাগজের মূল্য থাকিবে না। নুর-অল-ইমান সমাজের মেম্বরগণ আপনাদের মধ্যে চান্দা সংগ্রহ করিয়া ব্যয় সংকুলান করিবেন।"

তিনটি পত্রিকার উদ্ধৃতি থেকে সহজেই বোঝা যায় যে তখনকার দিনে অসীম নিষ্ঠা, ধৈর্য্য ও আগ্রহ নিয়ে গুটিকতক মানুষ দুর্দ্দশাগ্রস্ত মুসলমানদের জাগাতে চেয়েছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম্ম, শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পের বিকাশ সাধন করতে এবং পত্রিকা প্রকাশকে মনে করেছিলেন 'সামাজিক কার্য্য'। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে আমাদের সামনে পূর্ব্ব-পুরুষগণের সে চেষ্টা এবং সাধনা লুপ্ত প্রায়। হয়ত কিছুদিন পর তার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠবে। এখানে আমি অধুনাবিস্মৃত কয়েকটি পত্রিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করব।

মীর মশাররফ হোসেন পরিচালিত 'আজীজন নেহার' সম্ভবতঃ প্রাচীনতম মুসলিম সাহিত্য-পত্র। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে এটি পাক্ষিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়। কাঙাল হরিনাথ পরিচালিত 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র একটি সংখ্যায় (জুন ১৮৭৪ খৃঃ) "নূতন পুস্তক ও পত্রিকা" শীর্ষক আলোচনায় লেখা হয়ঃ "'আজীজন নেহার' মুসলমান কর্ত্তৃক সম্পাদিত পাক্ষিক

পত্রিকা। আমরা ক্রমান্বয়ে ইহার ৩ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার লেখকগণ আমাদিগের পরিচিত, এই ইঁহাদের নবোদ্যম নহে, তবে সাহস করিয়া পত্রিকা প্রচার করা নূতন বটে। ইঁহারা যে গুরুতর উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিয়াছেন তাহা সংসিদ্ধ হইবার যদিও বিস্তর অন্তরায় লক্ষিত হয়, তথাপি আজীজন নেহার দ্বারা তাহার কিছু না কিছু নিরাকৃত হইবে, এইরূপ আশা বিড়ম্বনার বিষয় নহে। ইহাতে যে কয়েকটি প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে অতি উপাদেয় ফল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আমরা প্রস্তাবগুলি মনোযোগসহ পাঠ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। ভাষা অতি মনোরম। মুসলমান লিখিত বলিয়া মনে হয়না; এমন কি অনেক আধুনিক হিন্দু লেখকের লিপিচাতুর্য্যকে ইহার নিকট বলিদান দিতে পরামর্শ দি। যাহা হউক আমরা লেখকদিগকে একটি অনুরোধ করিব, এতাদৃশ বৃহৎ সমুদ্র উত্তরণ করিতে হইবে, একটু মৃদুগতি অবলম্বন করিবেন, আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে তাড়াতাড়ি করিয়া শেষে মাঝখানে নিমগ্ন হন।"

'আজীজন নেহার' পত্রিকা এখন দুর্লভ। আমি কোলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারে (National Library) সন্ধান করে জেনেছি এ পত্রিকা সেখানেও নেই। বাঙ্গালী মুসলমানদের ঘোর দুর্দ্দিনে কোন্ প্রেরণায় মশাররফ হোসেন 'সাহস করিয়া পত্রিকা প্রচার' করেছিলেন, কোন 'গুরুতর উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ' করেছিলেন যা 'সংসিদ্ধ হইবার' পথে গ্রামবার্ত্তা 'বিস্তর অন্তরায়' দেখে-ছিলেন তা আজ আর জানার উপায় নেই। পত্রিকার লেখকগণ এমন কোন্ 'বৃহৎ সমুদ্র উত্তরণ' করার ব্যস্ত প্রয়াস পেয়েছিলেন যা লক্ষ্য করে গ্রামবার্ত্তা 'মাঝখানে নিমগ্ন' হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, সে রহস্য হয়ত অনুদ্ঘাটিতই থেকে যাবে। শোনা যায় মশাররফ হোসেনের কাছে তাঁর প্রথমা স্ত্রী আজীজন নেহার অবাঞ্ছিতা ছিলেন, অথচ তাঁর পত্রিকা পরিচালনার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার সঙ্গে ঐ নামটি অমর হয়ে আছে।

হাফেজ পত্রিকা ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক ছিলেন শেখ আবদুর রহিম। তখনকার দিনে পত্রিকা পরিচালনার ব্যাপারে মুসলমান সাহিত্যিকগণের মধ্যে সম্ভবতঃ ইনিই ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ ব্যক্তি। হাফেজ প্রকাশের পূর্ব্বে সাপ্তাহিক সুধাকর ও মাসিক মিহির ইনি সম্পাদনা করেন এবং সংযুক্ত মিহির ও সুধাকর পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করা কালেই হাফেজ পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

পত্রিকাটি "১৪নং জিকজ্যাক লেন, লতিফ যন্ত্রে শ্রী কেদার নাথ রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত" হয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল ।৵০ ; পত্রিকার কার্য্যালয় ছিল ৬৮নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। 'মার্চ ও এপ্রেল সংখ্যা থেকে পত্রিকা প্রকাশ ও মুদ্রণের ঠিকানা ১৪নং জিকজ্যাক লেন পরিবর্ত্তিত হয়ে ১৪নং মেটকাফ ষ্ট্রীটে পরিণত হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় পত্রিকার নামের নিচেই লেখা থাকিত

"বিবিধ বিষয়ক মাসিক পত্র

শেখ আবদর রহিম সম্পাদিত।"

এর পর বন্ধনীর মধ্যে লেখা থাকত "প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।" নিচে থাকত সূচীপত্র। প্রথম পৃষ্ঠার উল্টোপিঠে থাকত 'হাফেজের গ্রাহকগণের প্রতি' সম্পাদকের নিবেদন এবং পত্রিকার 'নিয়মাবলী'—

"১। হাফেজের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা।

২। ষান্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য গ্রহণ করা হয় না।

৩। হাফেজে বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম, প্রতি পৃষ্ঠা প্রত্যেকবার ৪৲ টাকা। অর্দ্ধ পেজ ২৷৷০ টাকা। প্রতি লাইন চারি আনা।" তারপর পত্রিকার বিষয় বস্তু আরম্ভ হওয়ার আগে ৩।৪ পাতা জুড়ে থাকত বিভিন্ন পুস্তকের বিজ্ঞাপন এবং 'ষোলফলা ছুরি' 'এলার্মিং টাইম পিস বা ঘুম ভাঙ্গা ঘড়ি', 'নকল হিরা বসান অঙ্গুরী', 'সুমধুর বাঁশী' প্রভৃতির ছবি ও বিজ্ঞাপন।

প্রথম সংখ্যা হাফেজের সূচনাতেই 'আভাষ' নাম দিয়ে সম্পাদক তাঁর মন্তব্যে লিখেছেন, "সর্ব্বশক্তিমান বিশ্ব পালক করুণাময়ের পবিত্র নাম স্মরণ পূর্ব্বক আজ আমরা আমাদের বহুদিনের সঙ্কল্পিত হাফেজকে বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাগণের

নিকট উপস্থিত করিতে সক্ষম হইলাম। এখন দয়াময়ের নিকট সকাতরে করপুটে প্রার্থনা যে, তিনি যেন তাঁহার অধম দাসকে অনুরূপ ক্ষমতা প্রদানে হাফেজকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপে পরিচালিত করিতে সক্ষম করেন এবং ইহাকে সকলের হৃদয়গ্রাহী করিতে আমাদিগকে যথোচিত ক্ষমতা প্রদান করেন। হে দয়াময়! আমাদের বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাগণকে বিদ্যার চর্চ্চা ও বিদ্যোৎসাহী হইতে বঞ্চিত করিও না। কারণ বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাগণ ঘোর আলস্য শয্যায় শায়িত হইয়া যেরূপ ভোগবিলাসে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, তাহাতে অচিরে তাঁহারা যে একেবারে ধ্বংসসাগরে নিমজ্জিত হইবেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সময় থাকিতে যদি তাঁহাদিগকে ভোগবিলাসরূপ ঘোর নিদ্রা হইতে জাগরিত না করা হয়, তাহা হইলে তোমার পবিত্র মনোনীত ধর্ম্মের উপাসকমণ্ডলীর অদ্যদিন কি দুর্দ্দশা হইবে, তাহা তুমিই বই আর কাহারও বুঝিবার ক্ষমতা নাই। হে সর্ব্বান্তর্য্যামিন! হাফেজ সেই ভোগবিলাস সুখাভিলাষী নিদ্রিত বঙ্গীয় মুসলমানদিগকে তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের অতীত গৌরব ও ধর্ম্মভক্তি কাহিনী এবং পবিত্র ধর্ম্মের পবিত্র রীতি নীতি শুনাইয়া জাগরিত করিবার জন্য তোমারই আশ্রয়ে ও অনুগ্রহে আজ বঙ্গের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইল। তুমিই হাফেজের একমাত্র বল ও সহায়।

বস্তুতঃপক্ষে 'নিদ্রিত বঙ্গীয় মুসলমানদিগকে তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের অতীত গৌরব ও ধর্ম্মভক্তি কাহিনী এবং পবিত্র ধর্ম্মের পবিত্র রীতিনীতি শুনাইয়া জাগরিত করিবার জন্য'ই হাফেজ ও অন্যান্য মুসলিম পত্রিকাগুলোর প্রকাশ ঘটেছে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয় দশকের শ্রেষ্ঠ মুসলমান সাহিত্যিকগণের সাহিত্য সৃষ্টির মূল্যও ঐ এক প্রেরণা দেখা যায়। সমাজকে জাগানোর প্রেরণা তাঁরা সন্ধান করেছিলেন ইসলাম ধর্ম্ম ও ইতিহাসের মধ্যে। তাঁদের লেখনী প্রধানতঃ পরিচালিত হয়েছিল ঐ পথেই এবং তারই ফলে আমরা পেয়েছি—তাপস কাহিনী, পান্দেনামা, ইসলাম ইতিবৃত্ত, স্পেন বিজয় প্রভৃতি গ্রন্থ।

প্রথম সংখ্যা হাফেজে সম্পাদক বলেছেন—"আমাদের মধ্যে এই একখানি মাত্র মাসিক পত্রিকা, ইহার উন্নতি ও স্থায়িত্বকল্পে বঙ্গীয় প্রত্যেক মুসলমান ভ্রাতার প্রাণপণে সাহায্য করা কি উচিত নহে?" সম্পাদকের উক্তি থেকে মনে হয় হাফেজ তখন বাংলার মুসলমান পরিচালিত একমাত্র মাসিক পত্র ছিল। এর আগে মিহির সুধাকরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মিহির ও সুধাকর নামে সাপ্তাহিক পত্রিকায় পরিণত হয়েছিল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে 'ইসলাম প্রচারক' বেরিয়ে দু বছর চলার পর বহুকাল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই হাফেজের প্রকাশ ঘটেছিল মুসলমানদের একমাত্র সাহিত্য পত্রিকারূপে।

পত্রিকার আনুকূল্যের জন্য মুসলমান সমাজের প্রতি সম্পাদকের আবেদন আশানুরূপ ফল সৃষ্টি করেছিল কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয় সংখ্যায় 'হাফেজের বিরাট উপহার' শীর্ষক এক বিজ্ঞাপনে লেখা হয়, "আমাদের গ্রাহকগণের মধ্যে অনেকের এককালীন ৩৲ বা ৩৷৷০ দেওয়া কষ্টকর বলিয়া আমরা বৎসরের মধ্যে ৩ বারে ৩৲ টাকা লইতে স্বীকৃত আছি। কিন্তু প্রত্যেকবারে উপহার দেওয়া হইবে। তজ্জন্য ডাক মাশুল ৷৷০ চারি আনা বেশী লওয়া হইবে।

প্রথমবারে নামাজতত্ত্ব ও সুরিয়া বিজয় উপহার দিয়া ১৷৷০ আদায় করা হইবে। তৎপরে অন্যান্য উপহার দিয়া টাকা আদায় করা হইবে। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণ সত্বর অগ্রসর হউন।"

পত্রিকার লেখক প্রধানতঃ ছিলেন—মীর মশাররফ হোসেন, কবিবর মুন্সী মোজাম্মেল হক, কবি কায়কোবাদ, মৌলভী মহম্মদ ইয়াকুব, শেখ ওসমান আলী, বি,এল এবং সম্পাদক শেখ আবদুর রহিম সাহেব। প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই একজন লেখকের একাধিক লেখা ছাপা হতো। তখনকার দিনে লেখকের অভাবই ছিল এর প্রধান কারণ। হাফেজে হিন্দু লেখকের কোন লেখা থাকতো না।

প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন, পত্রিকায় প্রকাশিত কাহিনী, কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতির মধ্যে তারই অভিব্যক্তি দেখা যায়।

'সভ্যতার ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা', 'শাহনামা', 'মুসলমানের গতকালীন শিক্ষা,' 'মুসলমানের সাহিত্যে আধিপত্য', 'ইসলামে বিদ্যার গৌরব', 'মামুনের সময় বিজ্ঞান চর্চ্চা' প্রভৃতি প্রবন্ধে এবং 'রমজান', 'আদর্শ প্রেমিক', প্রভৃতি কবিতায় মুসলমানের গৌরবময় ইতিহাস, মুসলিম সাধকগণের ধর্ম্মভক্তি, ইসলাম ধর্ম্মের বিধি-বিধান ও সুমহান শিক্ষাকে প্রকটিত করার চেষ্টা বিদ্যমান ছিল। লেখাগুলো থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে এর পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

টি, ইউ আহমদ, বি, এস লিখিত 'সভ্যতার ইতিহাসের একপৃষ্ঠা' নামক প্রবন্ধের আরম্ভ ঃ "যাঁহারা ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অস্বীকার করিতে পরিবেন না যে, মুসলমানগণ ইউরোপীয় উন্নতি এবং সভ্যতার জন্মদাতা। মুসলমানদের উন্নতি সময়ে যদি মুদ্রাযন্ত্র বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে এখন যাহা ইউরোপে হইতেছে, বহু পূর্ব্বে তাহা আমরা মুসলমানদের মধ্যে দেখিতে পাইতাম। এখন যেমন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের আবিষ্কার তড়িতবেগে বিস্তৃত হইতেছে, তখন মুসলমান পণ্ডিতগণের আবিষ্কার তদ্রূপে বিস্তৃত হইলে নূতন আবিষ্কারের সাহায্য করিত। যাহা কথিত হইল, এই প্রবন্ধে তাহা সমর্থন জন্য ইউরোপীয় নজীরের উপর নির্ভর করা হইয়াছে।" (জানুয়ারী, ১৮৯৭) খোন্দকার ফজলে রব্বি খান বাহাদুর লিখিত 'হকিকতে মুসলমানে বাঙ্গালা' বা 'The Origin of the Musalmans of Bengal' গ্রন্থের অনুবাদ করেন শেখ আবদুর রহিম সাহেব। হাফেজের প্রথম সংখ্যা থেকেই 'বাঙ্গালার মুসলমান' নামে এ অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। অনুবাদের ভূমিকায় তিনি লেখেন—"সম্পাদকীয় দায়িত্ব অতি গুরুতর। মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি-পত্র মিহির ও সুধাকর সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় গুরুভার মস্তকোপরি রক্ষা করিয়া সম্পাদকীয় সহস্র ভাবনা সত্ত্বেও উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। সুতরাং এ অনুবাদে যে কোনওরূপ ত্রুটি পরিলক্ষিত হইবে না, একথা কখনও সাহস করিয়া বলিতে পারিনা। যদি কাহারও চক্ষে কোনরূপ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, গুণগ্রাহী ব্যক্তিগণ, নিজগুণগ্রাহিতাগুণে, তাহা মার্জ্জনা করিবেন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।" মুসলমানদের অলসতা, বিলাসিতা ও

জ্ঞানবিমুখতা সম্পর্কে পত্রিকার লেখকগণ ছিলেন সচেতন। ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল নিদর্শনগুলো তাদের সামনে হাজির ক'রে তাঁরা চেয়েছিলেন মুসলমানদের জ্ঞান-স্পৃহাকে জাগ্রত করতে। 'খলিফা মামুনের সময়ে বিজ্ঞানচর্চ্চা' শীর্ষক প্রবন্ধের সূচনায় মহম্মদ ইয়াকুব লেখেন—"এতদ্দেশীয় মুসলমানদিগের অর্থাগমের কিঞ্চিদমাত্র সচ্ছলতা হইলে তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যার চর্চ্চা প্রায় লোপ পায়, বরং অনেকে অলস ও বিলাসী হইয়া পড়েন। আত্মশ্লাঘা, পরকুৎসা, গৃহবিরোধ প্রভৃতি তাঁহাদের প্রাতরোপাসনা হইয়া পড়ে। আমরা এ স্থলে অতীব পরাক্রান্ত, অতুল প্রতিভা-শালী এমন একজন মুসলমান সম্রাটের বিজ্ঞান চর্চ্চা বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি, যিনি বিপুল রাজ্যাধিকারী ও অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও, বিশেষতঃ অনিবার্য্য প্রজা বিদ্রোহিতা, গৃহবিবাদ প্রভৃতি বিষম বিপদ সমূহও যাঁহার অন্তঃকরণকে বিজ্ঞান চর্চ্চা হইতে বিরত রাখিতে পারে নাই। সেই ধীশক্তিসম্পন্ন বিদ্যোৎসাহী মহাত্মার নাম মামুনুর রশীদ।" (ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭)। দ্বিতীয় সংখ্যা হাফেজে সেখ ওসমান আলী, বি, এল, রচিত 'কংগ্রেস ও মুসলমান জাতি' শীর্ষক প্রবন্ধটি বিশেষ কৌতূহলপূর্ণ। কংগ্রেসে মুসলমানদের যোগ না দেওয়ার দুটি প্রধান কারণ তিনি উল্লেখ করেছেন—"প্রথমতঃ কংগ্রেস যেরূপভাবে গভর্ণমেণ্টের কার্য্যাবলীর সমালোচনা, প্রতিবাদআদি করিয়া থাকে, তাহাতে বোধহয় কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের বিরোধী, সুতরাং এহেন কংগ্রেসে মুসলমানদের যোগ দিয়া গভর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন হওয়া উচিৎ নহে।" "দ্বিতীয়তঃ মুসলমানেরা বলেন যে, কংগ্রেস দ্বারা কোন ফললাভ হইলে হিন্দুরাই তাহা বণ্টন করিয়া লইবে, মুসলমানেরা কিছুই পাইবেনা।" লেখক কংগ্রেসের সমর্থনে লেখনী ধরেছিলেন কাজেই কারণ দুটি ভুল প্রতিপন্ন করার চেষ্টাই তিনি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধে তৎকালীন মুসলমানদের রাজনৈতিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে তিনি মুসলমান সমাজের যে চারিত্রিক বিশ্লেষণ করেছিলেন তা নানা কারণে স্মরণ যোগ্য। তিনি লেখেন: "আমরা চিরদিন আলস্যেই কাটাইলাম। আমরা যদি অলস না হইতাম, আমরা যদি নিজের ভালমন্দ বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে আজ আমাদের এরূপ দুরবস্থা হইত না। কেহ আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি

প্রবেশ পূর্ব্বক আমাদের ভালমন্দ না দেখাইয়া দিলে আমাদের চলে না, আমরা এতই অসাড় ও জড় হইয়া পড়িয়াছি।.....ইংরাজেরা আমাদের দেশের রাজা হইয়া এদেশে ইংরাজী ভাষার প্রচলন করিলেন। দূরদর্শী হিন্দুগণ অনায়াসে বুঝিতে পারিলেন যে আর মুসলমানদের রাজত্ব নাই, পার্শি পড়িয়া আর কোনই ফল হইবেনা, সুতরাং তাঁহারা পার্শি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিলেন, তাহার ফলে অচিরে ইংরাজ রাজসরকারে ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ হিন্দুগণই প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিলেন। এদিকে মুসলমানগণ রাজ্য হারাইলেন, পরন্তু ঘৃণাবশতঃ ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিলেন না, সুতরাং রাজদরবারে তাঁহারা আর প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা চাকরীর নিমিত্ত ব্রিটিশ রাজের নিকট রোদন, কাকুতি মিনতি প্রভৃতি করিতে লাগিলেন। যাহা হউক স্বর্গীয় মহাত্মা নবাব আবদুল লতিফ একজন প্রকৃত হিতৈষী ও স্বজাতি বৎসল লোক ছিলেন। ইংরাজীভাষা শিক্ষা না করায় মুসলমান ভ্রাতাগণের যে, এরূপ দুরবস্থা হইয়াছে তাহা তিনি সম্যক বুঝিতে পারিলেন এবং কি উপায়ে মুসলমানদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার হয় তাহার নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি এক বিজ্ঞাপন দিলেন যে, "ইংরাজী শিক্ষার উপকার কি" এ সম্বন্ধে যাঁহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে তাঁহাকে একশত মুদ্রা পারিতোষিক দেওয়া হইবে। পার্শি ভাষায় রচনা করিতে হইবে। এই বিজ্ঞাপন পাইয়া মুসলমান মহলে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং তদবধি মুসলমানেরা ধীরে ধীরে ইংরাজী শিক্ষার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম কেহ দেখাইয়া না দিলে আমরা কিছুই দেখিতে পাইনা।"

হাফেজে প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা ছিল খুবই কম। কোন সংখ্যাতেই একটির বেশী কবিতা থাকত না। দ্বিতীয় সংখ্যায় কায়কোবাদের "ভারতে রমজান" নামে কবিতায় কবি পরাধীনতার গ্লানি ব্যক্ত করেছেন এবং স্বাধীন তুরস্কের গৌরব স্মরণ করেছেন:

"বিদায় বিদায় আজি হা পুণ্য রমজান
নীরবে আসিয়াছিল
নীরবেই চলে গেল
কাঁদাইয়া কোটি কোটি মোস্লেমের প্রাণ।
* *
আজি আমাদের শুধু দাসত্ব সম্বল,
অভ্যর্থনা করিবার
কিছুই তো নাই আর
আছে শুধু একমাত্র নয়নের জল।
* *
হা পুণ্য রমজান।
স্বাধীন তুরস্ক রাজ্য তব আগমনে,
উল্লাসে নাচিয়া উঠে;
অযুতে তরঙ্গ ছুটে
ভক্তিভরে উপবাসী মোস্লেমের মনে।"

মীর মশাররফ হোসেনের লেখাগুলোর মধ্যে পত্রিকায় প্রচলিত ধারার কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায়। সমাজ সম্পর্কে সচেতনতা তাঁর মধ্যেও ছিল, কিন্তু ধর্ম্ম বা ইতিহাস অপেক্ষা বাস্তব পরিবেশকেই তিনি সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন করেছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে হাফেজে প্রকাশিত 'টালা অভিনয়' নামক প্রহসনের মধ্যে তৎকালীন হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের পেছনে তিনি শয়তানের চক্রান্তকে ব্যঙ্গ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলা যায় যে, অধ্যাপক আবদুল লতিফ চৌধুরী তাঁর 'মীর মশাররফ হোসেন' পুস্তিকায় 'টালা অভিনয়'কে নাটক বলেছেন এবং এর প্রকাশকাল আনুমানিক ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ বলে নির্দ্দেশ করেছেন। অধ্যাপক আবদুল হাই সাহেব তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে এটিকে যাত্রা শ্রেণীর নাটক বলেছেন এবং গ্রন্থের প্রকাশ কাল ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ বলেছেন। অবশ্য মশাররফ হোসেনের গ্রন্থ দুর্লভ বলেই অনেক সময় অনুমানের উপর গ্রন্থ প্রকাশের সন তারিখ নির্দ্ধারণ করতে হয়।

'টালা অভিনয়ে'র মূল ঘটনা : আদালতের একটি ডিক্রিকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানে হাঙ্গামা। হিন্দু এবং মুসলমান বেশধারী ভূতেরা মিটিং করে হাঙ্গামা সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঘটনাস্থলে হিন্দুদের মধ্যে পুরোহিতের বেশধারী ভূতেরা এবং মুসলমানদের মধ্যে মোল্লাবেশী ভূতেরা উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। বাঙ্গালী মুসলমানদের দুরবস্থা সম্পর্কে লেখক ছিলেন সচেতন এবং তাদের প্রতি ছিলেন মমতাশীল। ভূতের মুখ দিয়েও তিনি তাদের দুর্দ্দশার কথা ব্যক্ত করেছেন। ষড়যন্ত্র সভার শেষে মুসলমান ভূত হিন্দু ভূতকে লক্ষ্য করে বলেছে : "বাঙ্গালার মুসলমানের কি কিছু আছে! বিশেষ নিম্ন শ্রেণীর লোকের পেটে অন্ন নাই, পরনে কাপড় নাই। হা ভাত, হা ভাত করে লুটপুটি যাচ্ছে। যাক আর সময় নষ্ট করে কাজ নাই—আজিকার মত আদাব আরজ করি। ঘটনা-স্থলেই দেখা হবে। আর আর কথা যা বাঁকী রইল সেইখানেই হবে। মেয়াভাই! মালাকুড়জালি নিতে ভুলো না। আমিও তসবিহ নিতে ভুলব না। লোকের মনে ধাঁধা লাগানো চাই। চক্ষে ধুলা দেওয়া চাই।"

হাফেজের প্রথম সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে 'তহমিনা' নামে মশাররফ হোসেনের একটি উপন্যাস বেরুচ্ছিল। 'তহমিনা' ঐতিহাসিক কাহিনী-মূলক রোমান্টিক প্রেম-উপাখ্যান। শাহনামায় সোহরাব-রুস্তমের যে কাহিনী তাই ছিল এ উপন্যাসের প্রধান উপাদান। এ সম্পর্কে উপন্যাসের মধ্যে লেখক বলেছেন, "কবিগুরু ফেরদৌস তুসী মহোদয়ের পদাঙ্ক চিহ্ন লক্ষ্য করিয়াই এই তহমিনা"।

হাফেজে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা 'উদাসীন পথিক' এই ছদ্মনামে লিখিত একটি কবিতা। এটিকে তিনি গাজী মিঞার বস্তানীর চতুর্বিংশ নথির শেষ অংশ বলেছেন। 'গাজী মিঞার বস্তানী' বলে যে গ্রন্থটি পাওয়া যায় তাতে বিশটি নথি আছে এবং অবশিষ্ট চারটি নথি অন্যত্র প্রকাশিত হবে বলে প্রকাশক গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' বলেছেন। লেখকের 'আমার জীবনী'তেও বস্তানীর কিছুটা অংশ প্রকাশিত হয়েছিল দেখা যায়, কিন্তু সেখানেও এই কবিতাটি নেই। বস্তানীর 'স্বত্বাধিকারী উদাসীন পথিক'। হাফেজে প্রকাশিত

কবিতাটিও ঐ ছদ্মনামে লেখা। ১৮৯০ সালে মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' প্রকাশিত হয়েছিল। কাজেই মনে হয় তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম গাজী মিঞা নয় বরং উদাসীন পথিক।

হাফেজ পত্রিকা এবং তার লেখকগোষ্ঠী ছিল অসাম্প্রদায়িক এবং হিন্দু-মুসলমানের মিলনকামী। স্বীয় ধর্ম্ম এবং সমাজ সম্পর্কে তীক্ষ্ণ সচেতনতা থাকলেও পরধর্ম্ম বা প্রতিবেশীর প্রতি তাঁদের কোন বিদ্বেষ ছিল না। বিশেষ করে মশাররফ হোসেনের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত উদার এবং হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রী ছিল তাঁর প্রাণের একান্ত কামনা। সত্য প্রকাশে তিনি ছিলেন নির্ভীক এবং সমাজের গভীরে তাঁর দৃষ্টি ছিল নিবদ্ধ। নিম্নে উদ্ধৃত তাঁর কবিতাটিতে তদানীন্তন মুসলমান সমাজের দৈন্য ও দুর্দশার যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় হিন্দুরা মুসলমানদের বিলাসিতা, অলসতা ও নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে মুসলমানদের চারিত্রিক অধঃপতনের সুযোগ গ্রহণ করে হিন্দু নায়েব গোমস্তরা কিভাবে মুসলমানদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছিল তার চমকপ্রদ বিবরণ কবিতাটিতে পাওয়া যায়। এখানে স্মরণযোগ্য যে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর নতুন হিন্দু ভূস্বামীরাই ছিলেন স্থিতিশীল হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের বুনিয়াদ আর এই মধ্যবিত্ত সমাজই আধুনিক বাঙ্গালী মনীষার জন্ম ও লালন ক্ষেত্র।

১৮৯৭ সালের জানুয়ারী সংখ্যা হাফেজে মশাররফ হোসেনের কবিতাটি যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল হুবহু সেভাবে নিচে দেওয়া হোল।

"বর্ত্তমান মুসলমান সমাজের একখানি চিত্র।

১। দ্বিতল ত্রিতল ঘর
খাড়া আছে ভিত্তি 'পর,
সুর্কি চুণ খসিয়া পড়িছে।

২। জানালা কপাট ভাঙ্গা
ভেঙ্গে পড়ে ইট রাঙ্গা,
কত গাছ শিকড় ছাড়িছে॥

৩। চামচিকে আরশুলা
দিনকানা পেঁচা গুলা
গিরগিটি জেঠী করে বাস।

৪। যাদের বাসের কথা
কুঁড়ে বেঁধে আছে তথা,
দালানের এ পাশ ও পাশ॥

৫। পেটে নাই অন্ন কণা
পরিয়াছে ছেঁড়া টেনা,
ছেঁড়া কাথা কাহার সম্বল।

৬। গরমে পরাণ যায়,
ঠেকিয়া লজ্জার দায়
গায় দেয় দো-সূতী কম্বল॥

৭। কেহ মোট খেটে খায়
কেহ বোটে দাঁড় বায়
কেহ কাটে জঙ্গলের কাট।

৮। কাঁটায় চিরিছে গা
কুড়ালে কাটিছে পা
শিরে কাট, ফিরে সারা হাট॥

৯। সে হাট তাদেরি(ই) ছিল,
মহাজন বেচে নিল,
এবে তারা কড়ার ভিখারী।

১০। মোটা কচু, কাঁচা কলা
আলু ওলে ভরি জালা,
বেচিতেছে বসিয়া দোধারী॥

১১। কাহার মাথায় বোঝা,
ভারেতে হইয়া কুব্জা
সোজাভাবে চলিতে না পারে।

১২। আজ অন্ন পেটে নাই
পাইবে দুই এক পাই
"ক"দিন চলিবে আর ধারে ?

১৩। তামাক, আগুন, টিকে
জোগাইছে দোকানিকে,
কেহ দেয় কলিকা সাজিয়া।

১৪। মাসিক বরাদ্দ আছে
তাতেই পরাণ বাঁচে,
ছেলেমেয়ে পরিবার নিয়া॥

১৫। এ হাট তাদেরি ছিল
ফাঁকি দিয়ে কেড়ে নিল
পুরাতন নায়েবের ভাই।

১৬। পৈত্রিক বসত বাড়ী
পুষ্করিণী গোলাবাড়ী
কিনিয়াছে তাহার জামাই॥

১৭। প্রথমেতে "ছুঁচ" হয়ে
পশে হিন্দু রয়ে রয়ে
মুসলমান জমিদার ঘরে।

১৮। ক্রমে চেপে বসে ঘাড়ে,
সাধ্য নাই মাথা নাড়ে,
"ফাল" হয়ে ফাড়ে চেরে পরে॥

১৯। বেঁড়ে বুড় বলদেরে
চোম্বা বলি সমাদরে
সদা মুখে যে আজ্ঞা হুজুর।

২০। সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়
জোড় হাতে কথা কয়
তোষামদে বড় বাহাদুর॥

২১। গণ্ডমূর্খ জমিদার
ফুলে হল ঢোলাকার
শুনিতেও ভাল লাগে কানে।

২২। আগপাছ নাহি চান
আহ্লাদেতে গলে যান
খাবি খান খুসীর তুফানে॥

২৩। যদি বলে জল উচা,
বলে হিন্দু তাই সাচা,
প্রতিবাদ করে না কাহার।

২৪। বিদ্যাহীন, বুদ্ধিহীন,
একেবারে অর্ব্বাচীন
বাঙ্গালার প্রায় জমিদার॥

২৫। অলসের দাস হয়ে
বিছানা বালিশ লয়ে
গড়াগড়ি যান দিনরাত।

২৬। মুখে দিতে দুট ভাত
উঠেনা উপরে হাত,
দিন দিন হয় কুপকাৎ॥

২৭। কাৎ হয়ে, চিৎ হয়ে
হুকো টানে শুয়ে শুয়ে,
মুখে করি সুবাসিত নল।

২৮। পরনিন্দা গ্লানি গীত,
শুনে হন হরষিত
গায় গীত মোসাহেব দল॥

২৯। যাঁহারা দেশের মান
মানি মধ্যে মান্যমান
ছিল মান সম্ভ্রম প্রচুর।

৩০। তাঁদের তনয় যাঁরা
আরদালি হরকরা
হইয়াছে মুটিয়া মজুর॥

৩১। সদরালা পুত্র যিনি
কাচারিতে পাখা টানি
করিছেন দিন গুজরান।

৩২। কেহ লাল পাগ বেঁধে
চাপরাস করি কাঁধে
পোড়া পেট জ্বালায় হয়রান॥

৩৩। ডেপুটির পুত্র হয়ে
ডেপুটির বাক্স লয়ে
পালকির আগে আগে ধায়।

৩৪। মুন্সেফের সন্তান
মারিয়া তামাকে টান
বাজারেতে টিকে বেচে খায়॥

৩৫। লক্ষপতি জমিদার,
সন্তান সন্ততি তাঁর
খেটে খায় অপরের বাড়ী।

৩৬। কাযেতে করিলে হেলা,
মার খায় দুই বেলা,
জুতা লাথি খড়মের বাড়ী॥

৩৭। কটিতে কাপড় আঁটা,
হাতেতে বাঁশের ঝাটা,
যায় কাঁটা ফেলিতে পথের।

৩৮। জিজ্ঞাস তাঁহার ঠাঁই,
পরিচয় পাবে ভাই,
সে যে পৌত্র কোন নবাবের॥

৩৯। হইয়ে ঘোড়ার ঘাসী,
ঘাস তোলে রাশি রাশি
খুরপই খুন্তির সহায়।

৪০। পরিচয় জিজ্ঞাসিলে
সত্যকথা প্রকাশিলে
অবিশ্বাস করিবে তাহায়॥

৪১। খাঁ বাহাদুরের নাতী
ছিল কোটা বাড়ী হাতী
আয়মাদার কিবা জমিদার।

৪২। গিয়াছে যা ছিল হায়
বার ভূতে লুটে খায়,
এবে হইয়াছে খুন্তি সার॥

৪৩। ঐ যে ভিখারী যায়,
ঝোলাঘাড়ে ফিরে চায়,
ডাক ওরে জিজ্ঞাস কি বলে।

৪৪। বাপ দাদা ধনবান,
ছিল বড় মান্যমান,
মাথা হেঁটে পূজিত সকলে।

৪৫। তাহাদের বংশধর,
ভিক্ষা মাঙ্গে ঘর ঘর,
হাতে মালা কাঁধে ছালা ঝুলী।

৪৬। গলায় তসবির দানা
দেরে বাবা! এক দানা,
প্রাণ যায়; মুখে এই বুলী॥

৪৭। দেখ দিল্লী লক্ষ্ণৌ গিয়ে,
আছে ভস্মে আচ্ছাদিয়ে,
কত মহামূল্য রত্নধন।

৪৮। শাহানসার বংশধর
পান বেচে করে ঘর,
কোচয়ানী করে কোন জন॥

৪৯। নবাব কুলের কুল
বেচিতেছে ফল মূল
মাথায় করিয়া বোঝা বোঝা।

৫০। আম, জাম, নারিকেল,
খরমুজা, পাকা বেল
ভারে দেহ হইয়াছে কুজা॥

৫১। হাতেতে হীরার বালা,
গলায় মোতির মালা,
কানে এয়ারিং ফিরোজার।

৫২। পায়েতে সোনার মল
করিতেছে ঝলমল,
কটিদেশে হেমচন্দ্র হার॥

৫৩। বেগম নবাবজাদী
বাইজীর হল বাঁদী
কেহ সাদী করে ভেড়ুয়ায়।

৫৪। কেহ গুড় গুড়ী মাজে,
কেহ বা তামাক সাজে,
কেহ বাও করিছে পাখায়॥

৫৫। বঙ্গের বুনেদী দল
গেছে সবে রসাতল,
কেহ মরা কেহ আধমরা।

৫৬। গেছে সবে হিন্দু ঘরে,
কেহ না তা দৃষ্টি করে,
আরও মুখে বলে ভাল তারা॥

৫৭। একবার মাথা তুলে
দেখ ভাই চক্ষু মেলে
মুসলমান কিসে হল সারা।

৫৮। জমিদারী কোথায় গেল
সোনারূপা কি হইল,
এত ঘর কিসে গেল মারা॥

৫৯। চিরকাল হিন্দুগণ
করিতেছে নির্য্যাতন
তবু জ্ঞান হলনারে হায়।

৬০। নিতেছে সকল টেনে,
তবু তারে নাহি চিনে,
চক্ষে ধাঁধা এমনি লাগায়॥

৬১। দেখ যত হিন্দু ঘর
কিসে হল ধনেশ্বর,
খোঁজ দেখি কারণ ইহার।

৬২। প্রতি মুসলমান ঘরে,
চাকুরীর সাজ পরে,
সর্ব্বনাশ করিল সবার॥

প্রকাশক—উদাসীন পথিক।"

হাফেজ পত্রিকা কতদিন চলেছিল তা সঠিক বলা যায়না, তবে এক বছরের বেশী যে চলেনি তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'কোহিনুর' পত্রিকার একটি আবেদন পত্রে লেখা হয়েছিল "ইসলাম প্রচারকের তিরোধানে, মিহিরের আকার পরিবর্ত্তনে, হাফেজের অন্তর্ধানে এবং মুসলমান পরিচালিত আরও অনেক মাসিকপত্রের অকাল মরণে অনেকে ভাবিয়াছিলেন বঙ্গে মুসলমান পরিচালিত মাসিকপত্র আর বুঝি বাহির হয়না। আমরা অনেক যত্নে, অনেক পরিশ্রমে, অনেক অর্থব্যয়ে কোহিনুর প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছি।" কোহিনুর পত্রিকা বেরোয় ১৩০৫ সালের আষাঢ় মাসে অর্থাৎ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে। 'হাফেজের অন্তর্ধান' ঘটেছিল তার আগেই। এথেকে বোঝা যায় হাফেজের আয়ু এক বছরের বেশী হয় নি।

কোহিনুর পত্রিকা এস, কে, এম, মহম্মদ রওসন আলীর সম্পাদনায়, ১৪নং মেটকাফ স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকার শীর্ষনামের নীচে সংক্ষেপে এ ভাবে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছিল ঃ—

"কোহিনুর
মাসিকপত্র ও সমালোচন
হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি উদ্দেশ্যে প্রকাশিত।"

প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে পত্রিকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে লেখা হয়— "হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি, জাতীয় উন্নতি, মাতৃভাষার সেবাকল্পে এবং কলিকাতা অনাথ আশ্রমের সাহায্যার্থে "কোহিনুর" প্রচারে ব্রতী হইয়াছি।.....কোন ধর্ম্ম বা জাতি বিশেষের সম্পত্তি করিয়া আমরা কোহিনুর পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক নহি। কেহ যেন কোহিনুরকে ঐরূপ মনে করিয়া ভ্রমে পতিত না হয়েন।"

কোহিনুর পত্রিকা হাফেজের চেয়ে অনেক বেশী সমৃদ্ধ ছিল। এর লেখকের সংখ্যা যেমন ছিল বেশী তেমনি লেখাগুলোর মধ্যে ছিল বৈচিত্র্য। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লেখাই এতে প্রথম থেকে প্রকাশ পেত। মীর মশাররফ হোসেন, কবিবর মুন্সী মোজাম্মেল হক, মুন্সী মহম্মদ রেয়াজ উদ্দিন আহম্মদ, কবিবর কায়কোবাদ, মৌলবি আবদুর রহিম, সেখ জমিরুদ্দিন, মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা, মৌঃ মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, পরিব্রাজক চন্দ্রশেখর সেন, ব্যারিষ্টার, অবিনাশচন্দ্র দাস এম, এ, প্রভৃতি হিন্দু মুসলমান সাহিত্যিকগণ এ পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন।

হাফেজ ও কোহিনুর উভয় পত্রিকাতেই হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ঐকান্তিক কামনা ব্যক্ত হয়েছে। কোহিনুরের প্রথম পৃষ্ঠায় পত্রিকার নামের নিচে তার প্রধান উদ্দেশ্য বলা হয়েছে 'হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি।' এ সব পত্রিকার লেখক ও পরিচালকগণ নিজ সমাজের বাস্তব দুর্গতি সম্পর্কে ছিলেন সচেতন এবং তাদের উন্নতির জন্য ছিলেন সচেষ্ট। এঁদেরকে বাংলার মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত বলা

যায় এবং এঁদের লেখা থেকে তখনকার মুসলিম সাহিত্যিকদের মানসটিকেও অনুধাবন করা যায়। আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবল কামনা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও জাতিকে উন্নত করার যে চেতনা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই হিন্দু মানসকে ব্যাকুল করেছিল, মুসলমানদের মধ্যে তা দেখা দিয়েছিল সে শতাব্দীর শেষে। রঙ্গলাল, হেম-নবীনের মত তাঁরাও নিজের ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, কিন্তু সে সচেতনতা হিন্দুর পুরাণ বা ইতিহাসকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করেনি। নিজের ধর্ম, শিক্ষা, সভ্যতা এবং সংস্কারকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন কিন্তু অন্যেরগুলোকে বিকৃত করার প্রয়াস পান নি। তাঁরা নিজের সমাজের সম্বিত ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের যথার্থ মিলন রচনার সদিচ্ছায়, বিরোধের বাস্তব কারণগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। বলা বাহুল্য, এ বিরোধ সম্পর্কে সকলের দৃষ্টিভঙ্গি একরকম ছিল না। ১৩০৫ সালের ভাদ্র সংখ্যা কোহিনুরে মশাররফ হোসেন 'সৎপ্রসঙ্গ' নামে এক প্রবন্ধ লেখেন। এতে তিনি হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের যে কোন বাস্তব ভিত্তি আছে তা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, "হিন্দু মুসলমানে বিবাদ—কি লইয়া বিবাদ? কিসের জন্য বিবাদ? নিরপেক্ষ চিত্তে যদি দশরাত্রি দশদিন একাসনে বসিয়া চিন্তা করিবার শক্তি জন্মে, তথাপি বিবাদের মূল কারণ খুঁজিয়া পাওয়া দুঃসাধ্য।" কিন্তু বিবাদ যে চলছিল সেটা বাস্তব সত্য। লেখক সে সত্যকে স্বীকার করেছেন এই বলে, "যেমন ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ, আত্মীয় স্বজনে কলহ, পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে মেয়েলী ঝগড়া।" কিন্তু এ বিরোধকে তাঁর মত উচ্ছ্বাসের দৃষ্টিতে সবাই দেখেন নি। ১৩০৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা কোহিনুরে ডাক্তার মহম্মদ মীর আলী 'এখন কর্ত্তব্য কি?' নামে এক প্রবন্ধে লেখেন, "অভিনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করিলে উপলব্ধি হইবে যে প্রধানতঃ চারিটি অন্তরায়বশতঃ উভয় জাতিতে সদ্ভাব স্থাপিত হইতেছে না। ১। ধর্ম্মের বিভিন্নতা ২। বঙ্গবিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের একদেশতা ৩। বঙ্গ সাহিত্যে মুসলমানদের চর্চ্চাহীনতা ৪। মুসলমানদের দুরবস্থা।" লেখক সহানুভূতির সঙ্গে প্রত্যেকটি কারণ বিশ্লেষণ করেছেন

এবং সেগুলো দূর করার পন্থা নির্দ্দেশ করেছেন। তৃতীয় কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "একদিন বঙ্গবাসী পাঠে অবগত হইলাম, কোন হিন্দু ভ্রাতা হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে, সরল হৃদয়ে ও সাগ্রহে উভয় ধর্ম্মের সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিতে গিয়া "আলি মক্কায় শিব স্থাপন করিয়াছেন", "বিবি ফাতেমা মহম্মদের পত্নী" ইত্যাদি ভ্রমসঙ্কুল পদ লিখিয়া বসিয়াছেন ; মুসলমানদের অন্তরে আঘাত প্রদান করিয়াছেন। হাসিও পায় দুঃখও জন্মে; দোষ কাহাকে দিব? মুসলমানেরা ত "সীতা রামের মা" বলেন না? বলিবেন কেন? তাঁহারা হিন্দু গ্রন্থ পাঠে অবগত হইয়াছেন, "জনকনন্দিনী সীতা রামের ঘরনী।" আচ্ছা মুসলমান ভাই সাহেবেরা, বলুন দেখি, আপনারা কোন গ্রন্থে "রমণী কুলতিলক প্রাতঃ-স্মরণীয়া ও পবিত্রা বিবি ফাতেমা সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার মোক্ষ পথপ্রদর্শক ও প্রেরিত মহাপুরুষ মহম্মদের প্রিয়তমা দুহিতা" এরূপ লিখিয়াছেন? লিখেন নাই। তবে হিন্দুগণ অবগত হইবেন কি প্রকারে? উপায় নাই। অতএব মোসলেম ভ্রাতাগণ! আপনারা জাগ্রত হউন! বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় আপনাদের শাস্ত্রসমূহ রচনা করিয়া প্রকাশ করুন, তবেই এরূপ মনান্তরের কারণ অন্তর্হিত হইবে।" প্রবন্ধের উপসংহারে লেখক মুসলমানদের আহ্বান জানিয়েছেন, "ভ্রাতঃ মোসলেম! যদি তুমি আপন সমাজের উন্নতি, তথা উভয় সমাজের একতা আকাঙ্ক্ষা কর, তবে প্রথমতঃ প্রকৃষ্ট শিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করতঃ স্ব-সাম্প্রদায়িক দুরাবস্থাপনয়ন কর।"

কোহিনুরের লেখকগণ শুধু যে নিজের ধর্ম্মচর্চ্চা এবং সমাজ সংস্কারের জন্য লেখনী চালনা করেছেন তা নয়। পরাধীনতার অভিশাপে দেশের মানুষের নির্য্যাতনকেও তাঁরা সাহসের সঙ্গে ভাষা দিয়েছেন। ওসমান আলী লিখিত 'বালকের বিলাপ' নামে একটি কবিতা এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কবিতার শীর্ষনামের নিচে বন্ধনীর মধ্যে লেখাছিল, "কোন বালককে প্রতারণা পূর্ব্বক কুলীরূপে বিদেশে চালান দেওয়ায় তাহার বিলাপ।" কবিতার শেষে পত্রিকা সম্পাদক তাঁর মন্তব্যে লিখেছিলেন, "কুলী গোয়েন্দাদের কৃপায়, আমাদিগকে এই সমস্ত কাতর ক্রন্দনধ্বনি অনেক শুনিতে হয়। নিঃসহায় বালকের এই 'বিলাপে'

সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই ব্যথিত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।" কবিতা হিসেবে এর মূল্য বেশী নয়। একটু উদ্ধৃতি দিলে কথাটা পরিষ্কার হতে পারে—

"হইল আমার বিদেশে বসতি,
স্নেহময়ী মাতা, কোথায় আমার
কোথা জন্মদাতা পিতা পূজ্যপাদ
সখাগণ কোথা বাল্যসহচর,
কোথা ভাই ভগ্নি, সৌহৃদ আস্পদ!"

কিন্তু কবিতাটির যে প্রকৃত মূল্য তা ঐ সম্পাদকের মন্তব্যেই ব্যক্ত হয়েছে।

১৩০৫ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে 'কোহিনুরে' মশাররফ হোসেনের 'নিয়তি কি অবনতি' নামে একটি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। লেখক এটিকে "সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা মূলক জীবন্ত উপন্যাস" বলেছেন। এক মুসলমান বৃদ্ধ জমিদারের সাত বছরের নাতির প্রতি অন্ধ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন স্নেহ প্রদর্শনই এ উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য বিষয়। নাতির আবদারে নানা প্রতিদিন বিয়ের অভিনয় করেন, নদীতে গোসল করতে গিয়ে একশ' এক ডুব দেন। এহেন নানার পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন, "নানা অতি বিচক্ষণ; বিদ্যাবুদ্ধিতেও দেশের মধ্যে অদ্বিতীয়। বয়সেও প্রাচীন, সংসার লীলাতেও পরিপক্ক ষোল আনা, এ অবস্থায় এ বয়সে ঐরূপ আমোদই বা কেন? নাতী যাহা বলে তাহাই করেন, কে বলিবে তাঁহার মনে কি জাগে! তিনি বালক নহেন তাঁহার বয়স ৬০ বৎসরের উপর। তিনি জমিদারী বিষয় কার্য্য এত বোঝেন যে আমরা যে সময়ের কথা কহিতেছি সে সময়ে তাঁহার মত একজন শিক্ষিত জমিদার বঙ্গদেশে অতি কমই দেখা যাইত, নিজ ক্ষমতায় নিজে জমিদারী হস্তে লইয়া কম হইলেও এক কোটি টাকা মজুদ করিয়াছেন। তাঁহার সরকারে এ পর্যন্ত কোন প্রধান কার্য্যকারক সর্ব্বে সর্ব্বা কেহই নিযুক্ত হয় নাই। সমুদয় কার্য্য নিজে পর্যবেক্ষণ করেন। এমন বিচক্ষণ লোক তাঁহার এ মতিগতি কেন হইল? এমন বুদ্ধিমান সুচতুর বিদ্বান তাঁহার এ দশা কেন? কে বলিবে।"

মশাররফ হোসেন তাঁর কর্ম্মজীবনে কয়েকটি বড় জমিদারী ষ্টেটের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তখনকার মুসলমান জমিদার এবং তাদের সমাজকে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ পেয়েছিলেন। কাজেই ঐসব জমিদারদের কাহিনী তাঁর সাহিত্যের বেশ বড় অংশ অধিকার করে আছে। উপরের উক্তি থেকে মনে হয়, 'নানা' বলে যে জমিদারের পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে লেখকের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। এবং সম্ভবতঃ এ জন্যই উপন্যাসে 'নানা'র নাম উল্লেখ করেন নি।

নাতির আবদারে নানার সবচেয়ে গর্হিত কাজ হোল হিন্দুর দেবমূর্ত্তিকে অপমান। একদল ব্রাহ্মণ 'মদন মোহন ঠাকুর'কে বয়ে নিয়ে যাওয়ার কালে নাতি আবদার তুল্‌লো, 'ঐ পুতুলটা আমি চাই।' নানার প্রভাবে নাতির আবদার রক্ষিত হোল। ক'দিন পরই নাতির খেয়ালে 'মদন মোহনকে কচুবনে যাইতে হইল'।

কোহিনুর পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলোর উপর সম্পাদক ইচ্ছানুসারে (লেখার শেষে পাদটীকার মত) নিজের মন্তব্য লিখিতেন।

'নিয়তি কি অবনতি' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সম্পাদক লিখেছেন, "হিন্দুর দেবতাকে এইরূপে লাঞ্ছিত করিয়া নানা অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। হিন্দুর দেবতাকে লাঞ্ছিত করিয়া বাহাদুরি লওয়া কোন মুসলমান জমিদারেরই উচিৎ নহে। কেননা উহাতে হিন্দুর ধর্মে ও প্রাণে আঘাত দেওয়া হয়। মানুষের প্রাণে আঘাত দেওয়া মুসলমান বিধিসিদ্ধ নহে উহা মহাগ্রন্থ কোরানে নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে মুসলমানের ধর্ম্মকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া মুসলমানের হৃদয়ে আঘাত করাও কোন হিন্দু জমিদারের পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। ঐরূপ কার্য্য হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রেরও যে বিরুদ্ধে তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই।"

কোহিনুর-সম্পাদকের মন্তব্যের মধ্যে তদানীন্তন শিক্ষিত মুসলমান মানসের যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে। নিজ ধর্ম্ম সম্পর্কে নিষ্ঠাবান হয়েও তাঁরা অপরের ধর্ম্ম সম্পর্কে ছিলেন শ্রদ্ধাশীল এবং বিভিন্ন ধর্ম্মের সহ-অবস্থান সম্পর্কে ছিলেন

বিশ্বাসী। কোরানের বাণী, 'লাকুম দীনাকুম ওয়ালিয়া দীন' মন্ত্রের তাঁরা ছিলেন প্রকৃত অনুসারী।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মীর মশাররফ হোসেন ও এস্, কে, এম, মহম্মদ রওসন আলীর যুগ্ম সম্পাদনায় পাক্ষিক 'হিতকরী' পত্রিকা নবপর্য্যায়ে প্রকাশিত হয়। কোহিনুর পত্রিকার গ্রাহক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রচারিত এক আবেদন পত্রে 'হিতকরী' নতুনভাবে প্রকাশের সংবাদ প্রচার করা হয়, "হিতকরী ১৩০৬ সালের শুভ বৈশাখ হইতে নূতন প্রণালীতে খাঁটী নিখুঁত মুসলমানি ভাবে বাহির হইবে। আরবি, পারসি, উর্দ্দু, হিন্দি ও ইংরাজী সংবাদপত্র সমূহের সার সঙ্কলন করা হইবে। কৃতবিদ্য ও বিখ্যাত লেখকগণের গভীর গবেষণা প্রসূত প্রবন্ধ মালায় এবং ধর্ম্মগ্রন্থাদির বঙ্গানুবাদ, জাতীয় ইতিহাস, মনোরম উপন্যাস, জাতীয় সংবাদ প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ থাকিবে।"

১৯৫৮ সালের ফ্রেব্রুয়ারী সংখ্যা মাহেনও-এ জনাব আবদুল কাদির লিখিত "মিহির ও সুধাকর" শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয়েছে, "১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মীর মশাররফ হোসেন হিতকরী বের করেন।" কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত।

হিতকরী নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা ১৮৯০ সালের প্রথম দিক থেকে "কুমারখালী মথুরানাথ যন্ত্রে, শ্রীরজনীকান্ত ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত" এবং কুষ্টিয়া লাহিনীপাড়া, শ্রীদেবনাথ বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত হচ্ছিল। পত্রিকার অতি জীর্ণ যে ক'টি সংখ্যা আমি পেয়েছি তার একটি প্রকাশ হয়েছিল ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর 'প্রথম ভাগ—১৭শ সংখ্যা' হিসেবে। কাজেই অনুমান করি, ঐ বছরের এপ্রিল থেকে পত্রিকাটি প্রকাশ হতে থাকে। পত্রিকায় সম্পাদকের নাম নেই তবে একটি বিজ্ঞাপনে সহকারী সম্পাদকের নাম আছে, 'রাইচরণ দাস'। পত্রিকার এজেন্ট বলে দু'জনের উল্লেখ আছে, "শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, বি, এল, গোয়াড়ী। ২। শ্রীযুক্ত মীর মশাররফ হোসেন, শান্তিকুঞ্জ, টাঙ্গাইল।" কোহিনুরের আবেদনপত্রে মীর মশাররফ হোসেন ও রওসন আলী কর্ত্তৃক সম্পাদিত যে 'হিতকরী' পত্রিকার কথা বলা

হয়েছে তা এই কুমারখালী থেকে প্রকাশিত পত্রিকারই নবপর্য্যায়। "নূতন প্রণালীতে খাঁটি নিখুঁত মুসলমানীভাবে" প্রকাশিত পর্য্যায়। আবেদনপত্রে মুসলমানদের হিতকরীর গ্রাহক হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে "হিতকরী নামের উপর কাহারও যেন বৃথা আক্রোশ বা অশ্রদ্ধা না হয়।" এ থেকে মনে হয় হিন্দু পরিচালিত হিতকরী নামটির ইঙ্গিতই দেওয়া হয়েছে।

কুমারখালী থেকে প্রকাশিত হিতকরী পত্রিকার সঙ্গে মশাররফ হোসেনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। পত্রিকার প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই তাঁর গ্রন্থগুলোর বিজ্ঞাপন থাকত। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থটি যে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল তা এ পত্রিকার ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর সংখ্যায় এক বিজ্ঞাপন দেখে নিশ্চিত হওয়া যায়। বিজ্ঞাপনটি এরূপ, "উদাসীন পথিকের মনের কথা ছাপা শেষ হইয়াছে, মূল্য ১৲ টাকা, ডাক মাশুল /০ আনা। অর্ডার পাইলে ভিঃ পিঃ পোষ্টেও পাঠান যায়।—

মীর মশাররফ হোসেন,
শান্তিকুঞ্জ, টাঙ্গাইল।"

এ পত্রিকায় প্রকাশিত মশাররফ হোসেনের 'আমাদের শিক্ষা' প্রবন্ধে তিনি বাঙ্গালী মুসলমানদের 'বাঙ্গালা' শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে গিয়ে বলেছেন ঃ "বঙ্গবাসী মুসলমানের দেশভাষা বা মাতৃভাষা "বাঙ্গালা"। মাতৃভাষায় যাহার আস্থা নাই, সে মানুষ নহে। বিশেষ সাংসারিক কাজকর্ম্মে মাতৃভাষারই সম্পূর্ণ অধিকার। মাতৃভাষায় অবহেলা করিয়া অন্য ২ ভাষায় বিখ্যাত পণ্ডিত হইলেও তাহার প্রতিপত্তি নাই। পরিবার, আত্মীয় স্বজন, এমন কি প্রাণের প্রাণ যে স্ত্রী, তাহার নিকটেও আদর নাই। অসুবিধাও বিস্তর। ইস্তক ঘরকন্নার কায, নাগাএদ রাজসংশ্রবী যাবতীয় কার্য্যে বঙ্গবাসী মুসলমানের বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োজন।"

হিতকরী পত্রিকাটিও ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলনকামী। এর লেখক এবং গ্রাহকের মধ্যে মুসলমানের প্রাধান্য ছিল। ১২৯৭ সালের ১৫ই বৈশাখের

এক সংখ্যায় হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ধর্ম্মসভার একটি সংবাদ অত্যন্ত উল্লাসের সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছিল : "ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিয়া, আনন্দের সহিত প্রিয় পাঠকগণকে একটি সুসমাচার প্রদান করিতেছি। বিগত ৪ঠা চৈত্র রবিবার টাঙ্গাইল মুনসেফী আদালতের নিকটস্থ প্রাঙ্গণে এক অভাবনীয় ঘটনা সংঘটন হইয়া গিয়াছে। শুধু অভাবনীয় ঘটনা বলিয়াই যে ক্ষান্ত হইব, তাহা নহে। এক মহতী সুকীর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। পাঠক! যাহা মহানগরে ঘটে নাই, নগরে ঘটে নাই, পল্লিগ্রামে সংঘটন হয় নাই, তাই আজ আটীয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জমিদার হাফেজ মহাম্মদ আলী খাঁ সাহেবের আন্তরিক যত্নে, অতীব সুশৃঙ্খলরূপে ঘটিয়াছে। দেখুন, যত্নে কি না হয়? চেষ্টায় কি না সাধন হয়? যে হিন্দু মুসলমানের নাম শুনিয়া মুখে রাম রাম বলিয়া দু' হাত সরিয়া পড়িয়াছেন, যে মুসলমান হিন্দুর নাম শুনিয়া কাফের বেদীন বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন, আজ সেই হিন্দু সেই মুসলমান, মাননীয় জমিদার সাহেবের সৌজন্যতায় ও যত্নে ধর্ম্মপ্রচার সংযোগে, একক্ষেত্রে, একস্থানে, অপূর্ব্ব দৃশ্য! অপূর্ব্ব মিলন! চমৎকার ভাব!"

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রাজশাহী শহরে 'আঞ্জুমনে হেমায়েতে এসলাম' নামে মুসলমানদের এক সংগঠন সৃষ্টি হয়। একটি ছাপানো 'অনুষ্ঠান পুস্তিকা'য় এ সংগঠনের জন্ম ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় : "আমরা অত্যন্ত আহ্লাদ সহকারে জানাইতেছি যে, গত ১১ই ও ১২ই পৌষ বৃহস্পতি ও শুক্রবার বোয়ালিয়া হেতাম খাঁ মসজিদে একটি বৃহতী সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় রামপুর বোয়ালিয়া শহরের এবং রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলার মফঃস্বলের বহুসংখ্যক সভ্য সমাগত হন।.....এ সভার উদ্দেশ্য অতীব মহৎ এবং গুরুতর। (১) কি উপায়ে ধর্ম্মের উন্নতি হইবে, (২) কি প্রকারে মুসলমান সম্প্রদায়ের (কওমের) লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া আসিবে, (৩) কিসে ন্যায্য-জীবিকার (হালাল রুজীর) পথ প্রশস্ত (কোসাদা) হইবে, (৪) কি উপায়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যার আলোক প্রবেশ করিবে ও মুসলমান বালক-দিগকে বিদ্যাশিক্ষার সাহায্য করা যাইবে, এই সকল বিষয় পরামর্শ করিয়া গবর্ণমেণ্টের আইনসঙ্গত উপায় অবধারণ ও তাহা কার্য্যে প্রচলন; ইহাই এই

সভার উদ্দেশ্য।" 'আঞ্জুমনে হেমায়েতে এসলাম গঠনের ২।১ বৎসরের মধ্যে' 'বঙ্গদেশীয় কতকগুলি আলেম, ফাজেল ও বিদ্বান লোক লইয়া নুর-অল-ইমান সমাজ গঠিত' হয়। এই সমাজের মুখপত্র হিসেবে, ১৩০৭ সালের আষাঢ় মাসে (ইংরেজী সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০০ খৃঃ) নুর-অল-ইমান নামে এক 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশ করা হয়। পত্রিকাটি "নুর-অল-ইমান সমাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত" এবং "মীর্জ্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলী কর্ত্তৃক শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সজ্জীকৃত" হয়। পত্রিকা প্রকাশ হয় ৪নং কড়েয়া গোরস্থান রোড, রেয়াজ-উল-ইসলাম প্রেস থেকে। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় এর উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে বলা হয়ঃ "আঁধার রজনীতে মানুষের হাতে উজ্জ্বল আলোক যেমন সহায়, সৃষ্টিকর্ত্তা খোদাতাআলা, বুদ্ধিকে সেইরূপ একটি উৎকৃষ্ট স্বর্গীয় আলোক দিয়াছেন, সেই আলোককে সাধু বাঙ্গলায় বিবেক এবং ইংরেজীতে conscience কনশ্যেন্‌স্‌ কহে। সেই পদার্থকেই আরবী ভাষায় নুর-অল-ইমান বলে। যে "নুর" অর্থাৎ আলোকের সাহায্যে বুদ্ধি স্বয়ং কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, সৎ অসৎ, ভালমন্দ, পাপ পুণ্য চিনিতে পারিয়া সৎপথে চলিতে পারে, সেই আলোককে নুর-অল-ইমান বলে।..... বঙ্গদেশের মুসলমান সমাজে কতকগুলি হানিকর দোষ—মারাত্মক রোগ—প্রবেশ করিয়া মুসলমান কওমকে পাতালে ডুবাইয়া দিয়াছে। পূর্ব্ব কালের মুসলমানদিগের কি কি সদগুণ ছিল? কোন কোন গুণের জন্য তাঁহারা জগতের পূজা পাইয়াছেন নুর-অল-ইমান তাহা সকলকে দেখাইয়া দিবেন।.....কি কি দোষ মুসলমান কওমের মধ্যে কি ভাবে প্রবেশ করিল? কোন কোন মারাত্মক পীড়া আমাদের সমাজে প্রবেশ করিয়া সমাজের জীবন নষ্ট করিতে লাগিয়াছে, তাহাও নুর-অল-ইমান দেখাইবে। কোন দোষ দূর করিবার কি উপায়, কোন রোগ নিবারণের কি ঔষধ, নুর-অল-ইমান তাহারও ব্যবস্থা সকলকে শিখাইবে। কোন গুণটি কি উপায়ে লাভ করা যায়? কোন বল বা সৌন্দর্য্য কি তদবিরে পাওয়া যায়, তাহাও নুর-অল-ইমান শিক্ষা দিবে।" পত্রিকাটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করার কথা বলে সম্পাদক বলেছেন, "এ কাগজের হেমায়েতে এসলাম ও নুর-অল-ইমান নামক দুই ভাগ থাকিবে।.....হেমায়েতে এসলাম অংশে মুসলমান

কওমের কথা, এসলাম সমাজের সভা-সমিতির কথা আলোচনা করা হইবে। আর নুর-অল-ইমান অংশে ইমানের সহিত সম্বন্ধ রাখে, এমন বিষয়ের অর্থাৎ ধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনা হইবে।"

উপরে যে আদর্শ এবং উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে তার যথাযথ প্রতিফলন পত্রিকাটিতে দেখা যায়। আঞ্জুমানে হেমায়েতে এসলাম ও নুর-অল ইমান এ দুটি সংগঠনের সাহায্যে মুসলমান সমাজে ধর্ম্মের পুনরুজ্জীবন ও বিদ্যাশিক্ষা প্রচারের চেষ্টা করা হোত। মুষ্টি ভিক্ষা ও চাঁদা আদায়ের দ্বারা সংগঠনের কর্ম্মীরা গরীব ছাত্রদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতেন এবং শিক্ষার অন্যান্য ব্যয়নির্ব্বাহে সাহায্য করতেন। নুর-অল-ইমান পত্রিকায় সাংগঠনিক কার্য্য বিবরণী ও হিসাবপত্র প্রকাশ করা হোত। এ পত্রিকাতেই হজরত ইমাম গজ্জালীর কিমিয়া সাআদৎ গ্রন্থের অনুবাদ 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেন মির্জ্জা ইউসুফ আলী। পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতির মধ্যে মুসলমান সমাজকে জাগানোর আহ্বানই ছিল প্রধান। ভাদ্র সংখ্যায় (১৩০৭ সাল) 'আবাহা' নামে একটি কবিতায় এসমাইল হোসেন লেখেন :—

"ভাই মোসলমান! নয়ন মেলিয়া
ওঠ একবার উঠরে জাগিয়া
আর কত কাল ওরে ভ্রাতৃগণ
বিঘোর নিদ্রায় রবে নিমগন?
এ নিদ্রাবশে রাজ্যধন গেল,
সম্মান গৌরব সকলি ফুরাল।"

তিনি প্রতিবেশী হিন্দুর দিকে মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন—

"দেখ বিদ্যাবলে হিন্দুর সন্তান
লভিছে কেমন গৌরব সম্মান।"

এবং যদিও হিন্দু মুসলমানের—

"একই দেশেতে এক গ্রামে বাস,
এক অন্নজলে ক্ষুধাতৃষ্ণা নাশ,
একই রাজার শাসন অধীন।"

তবু বিদ্যাবলে 'হিন্দু আজি ধনী, মোসলমান দীন !!' কাজেই তিনি মুসলমানদের আহ্বান জানিয়েছেন—

"তাই বলি ভাই ওরে মোসলমান।
বিদ্যার শিক্ষায় হও আগুয়ান।"

১৩০৮ সালের আষাঢ় সংখ্যায় দেওয়ান নাছিরুদ্দিন আহম্মদ নামে রাজশাহীর এক কবি 'আবেদন' নামে এক সুদীর্ঘ কবিতা লেখেন। তিনি হিন্দু মুসলমানকে দেশমাতার দু'পা রূপে কল্পনা করেছেন—

"এ ভারত হিন্দুস্থান যেন একজন।
হিন্দু-মুসলমান তার দুই পদ হন॥
এই দুই জাতির উপর ভর দিয়া
দেশমাতা উন্নতিতে যাবেন ধাইয়া॥
এর মাঝে একপদ খোঁড়া যদি হয়।
আছাড় খাইয়া মাতা পড়িবে নিশ্চয়॥
উন্নতির পথে চলা বিফল হইবে
আছাড়ের চোটে মাতা জ্ঞানহারা হবে॥
শিয়াল কুকুরে তার মাংস খুলি খাবে
দেশবন্ধু হিন্দুরা কি খেয়াল করিবে?"

তিনি হিন্দু সমাজকে মুসলমানদের উন্নতির জন্য সাহায্য করতে অনুরোধ করেছেন। কবি জানেন, "এসলাম সমাজ মাঝে যত রোগ বিরাজিছে, তার মাঝে মূর্খতা প্রধান"। কাজেই তিনি উপদেশ দিয়েছেন, "এলেম বিস্তার করি 'জেহালৎ' পরিহরি, সাধ সবে জাতীয় কল্যাণ।"

আধুনিক যুগে, বাংলা সাহিত্য চর্চ্চার ক্ষেত্রে মুসলমানদের পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের ভাষা নিয়ে বিরোধের সূত্রপাত হয়। সংস্কৃত প্রভাবিত বিশুদ্ধ বাংলার সমর্থক হিন্দুরা ভাষায় আরবী-পারসী শব্দের ব্যবহার বরদাস্ত করতে চাননি। উনিশ শতকের শেষদিকে মির্জ্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী "মোসলমান সমাজের উন্নতির জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক" তা বর্ণনা করে "দুগ্ধ সরোবর নামক একখানি কওমী পুস্তিক. প্রণয়ন ও প্রচার করেন।" এ পুস্তিকার ভাষা নিয়ে তখন বিরূপ সমালোচনা হয়। ১৩০৭ সালের শ্রাবণ সংখ্যা নুর-অল-ইমানে এ সম্পর্কে লেখা হয়, "বহু শতাব্দী হইতে যে সকল আরবী, পারসী, হিন্দী ইত্যাদি নানা ভাষার শব্দ, নানা কারণে বাঙ্গলার গ্রাম্য অধিবাসীর প্রচলিত ভাষার সহিত রক্তমাংসের ন্যায় মিশিয়া গিয়াছে, সেই সকল শব্দের কিছু কিঞ্চিৎ দুগ্ধ সরোবরে ব্যবহার করা হইয়াছিল ; তজ্জন্য সেই দুগ্ধ সরোবরের সমালোচনাকালে কোন খবরের কাগজওয়ালা হিন্দু, ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, "মুসলমানের বাবুরচি খানার পক্ক দুগ্ধ হিন্দুর অস্পৃশ্য, এই জন্য আমরা এ দুগ্ধের আস্বাদ লইতে পারিলাম না।"

কিন্তু হিন্দু সমাজের কেউ কেউ মুসলমানদের সাহিত্য এবং বিদ্যাচর্চ্চায় সাহায্যও করেছেন। যে দুগ্ধ সরোবরকে 'কাগজওয়ালা হিন্দু' বিদ্রূপ করেছেন, নুর-অল-ইমান পত্রিকার বিবরণেই দেখা যায়, সে পুস্তিকা পড়ে হিন্দু জমিদার মুসলমান সমাজকে অর্থ সাহায্য করেছেন। এ সম্পর্কে পত্রিকার ৩৪ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, "পক্ষান্তরে উত্তরবঙ্গের আমীর হিন্দু কুলরত্ন কোন বিদ্বান জমিদার সেই দুগ্ধ সরোবর পাইয়া (কোন সূত্রে পাইয়াছিলেন সেক্রেটারী তাহা জানেন না) তাহার রসাস্বাদে পরিতুষ্ট হইয়া, নুর-অল-ইমান সমাজকে উৎসাহিত করিবার জন্য কিছু অর্থ নজর স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন।" আঞ্জুমানের শিক্ষা বিস্তার কাজে হিন্দুগণ যে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য করতেন তার অনেক নিদর্শন. পত্রিকাটিতে পাওয়া যায়। পত্রিকার ২৪ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "এ স্থানে আর একটি খোস খবর না দিয়া থাকা যায় না । আমাদের প্রতিবাসী হিন্দু ভ্রাতৃগণ

আমাদের এই শিক্ষাবিস্তার কার্য্যেও প্রাণের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন।" পত্রিকায় আঞ্জুমানকে অর্থ সাহায্য দাতাদের যে তালিকা প্রকাশিত হোত তার মধ্যে অনেক হিন্দুর নাম দেখা যায়।

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ দূর করার জন্য এক শ্রেণীর হিন্দু সাহিত্যিকও চেষ্টা করেছিলেন। কোহিনুর, নবনূর প্রভৃতি পত্রিকায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৩১১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা নবনূরে জীবেন্দ্রকুমার দত্ত 'হিন্দু-মুসলমানের মিলন কি অসম্ভব?' নামে এক প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধে তিনি মিলনের পক্ষে নানাপ্রকার যুক্তি উপস্থিত করেন এবং উপসংহারে একটি কবিতা লিখে মিলনের প্রার্থনা করেন—

"জয় ভারতের জয়!
হিন্দু-মুসলমান ভারত সন্তান
কখনি ভিন্ন নয়
একই মার শোণিত ধার
দোঁহারি বক্ষে বয়।"

১৩১২ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা কোহিনুরে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার 'হিন্দু-মুসলমান' শীর্ষক কবিতায় লেখেন—

আমার বক্ষের লেখা মম শত অপরাধ
তুমি মুছ সুকুমার করে
তব হৃদি বহ্নি আমি অশ্রু দিয়া নিবাইব
আমি ক্ষমি, তুমি ক্ষম মোরে।"

মুষ্টিমেয় লোকের ঐকান্তিক চেষ্টা হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ দূর করতে পারেনি। জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতি বুদ্ধিজীবী হিন্দুর ক্রম-বর্দ্ধমান বিদ্বেষ মিলনের বীজকে অঙ্কুরিত হতে দেয়নি, কবিতার কুসুম ফুটলেও মিলনের মহীরুহ উদ্গত হতে পারেনি। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের মে-জুন সংখ্যা 'ইসলাম প্রচারকে' শেখ ফজলুল করিম 'উন্নতির উপায় কি?' প্রবন্ধে দেশ

ও জাতির উন্নতির জন্য হিন্দু-মুসলমানের মিলন কামনা করতে গিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন, "বড় পরিতাপের বিষয়, কংগ্রেসওয়ালাদের মধ্যেও অনেকে মুসলমানকে ঘৃণা করিয়া, আপনাদিগকে বাহাদুর মনে করে। জানিনা হিন্দু-মুসলমানের জাতিগত পার্থক্যের এই ঘৃণিত নাটকের কতদিনে যবনিকা পতন হইবে।"

ঊনিশ শতকের গোড়া থেকে স্বতন্ত্রধর্মী যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হিন্দুদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল, সাহিত্যে তার প্রকাশ হয়েছিল মুসলিম বিদ্বেষরূপে। যে ইতিহাসকে অবলম্বন করে হিন্দু জাতীয়তাবোধের অভিব্যক্তি ঘটে তা ছিল পাঠান এবং মোগলদের ইতিহাস; সে ইতিহাসকে কেন্দ্র করে যে সব কাব্য, উপন্যাস, নাটক রচিত হয় তাতে প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু বীরদের মহৎরূপে দেখানোর জন্য সুলতান, বাদশাহ প্রভৃতির চরিত্রই যে শুধু হীনভাবে অঙ্কিত করা হয় তাই নয়, সাধারণ মুসলমানদেরকেও 'ম্লেচ্ছ' 'যবন' বলে সম্বোধন করা হয়। সাহিত্যে এ ধরণের অভিব্যক্তি মুসলমানদের মনে যে নিদারুণ বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল তারও পরিচয় মুসলিম পত্রিকাগুলাতে পাওয়া যায়। সুফি ময়েজুদ্দিন আহমদ ওরফে মধু মিঞা সম্পাদিত 'প্রচারক' নামে 'বিবিধ বিষয়ক মাসিক পত্রিকা'র ১৩০৬ সালের মাঘ সংখ্যায় ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'চোখ গেল' নামে একটি কবিতা প্রকাশ হয়। 'বাসন্তী পূর্ণিমা নিশি'তে 'পাপিয়া পাখি'র চোখ গেল ডাক শুনে কবি মনে করেছেন মুসলমানের দুর্গতি দেখে পাখী আর্ত্তনাদ করছে। মুসলমানদের এত অবনতি হয়েছে যে—

"গোলাম হিন্দুর জাতি তাহারাও দিবারাতি
হেরে এবে ঘৃণার নয়নে;
'ম্লেচ্ছ' 'যবন' বলি দেয় সদা গালাগালি
অস্পৃশ্য ভাবিয়া গণে মনে।"

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যবন শব্দটির পৌরাণিক ব্যাখ্যা দিয়ে কোন কোন হিন্দু লেখক মুসলমান সমাজকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতেন। কিন্তু সেটা যে কত

নিরর্থক তা সরলা দেবী ঘোষালের এ উক্তি থেকে পরিষ্কার হতে পারে—"Whatever may have been the original application of the term "Native", its present use as a term of contempt admits of no doubt. In the same way, the epithet "yavana" has been hopelessly pointed."

বাংলা সাহিত্যে হিন্দু মানসের এ ধরণের প্রতিফলন মুসলমান সমাজকে কতটা বিক্ষুব্ধ করেছিল তার পরিচয় সিরাজীর 'মুসলমান জাতি ও হিন্দু লেখক' প্রবন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ থেকে পাওয়া যায়। "বিগত ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মুসলমান শিক্ষা সমিতির কলিকাতা নগরীতে যে অধিবেশন হইয়াছিল, যথায় ভারতের যাবতীয় গণ্যমান্য শিক্ষিত পদস্থ মুসলমান সমাগত হইয়াছিলেন; সেই বিরাট সভায় বঙ্গীয় মুসলমানদিগের পক্ষ হইতে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু সমাজহিতৈষী খ্যাতনামা জমিদার মাননীয় সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী সাহেব 'বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমান বিদ্বেষের বিরুদ্ধে' একটি রেজুলিউশন পাশ করেন। সমস্ত মুসলমানই আনন্দ এবং উষ্ণ সহানুভূতির সহিত ইহার অনুমোদন করেন। পরে এই রেজুলিউশনটির বিবৃত বিষয় ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া 'ভার্ণাকুলার এজুকেশন ইন বেঙ্গল' (Vernacular Education in Bengal) নাম দিয়া গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করা হয়। এই গ্রন্থ সমালোচনার জন্য বহু হিন্দু সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হইলেও তাহাতে তাঁহারা কিছুমাত্র মনোযোগ প্রদান করেন নাই।"

আশ্চর্য্যের বিষয় হিন্দুদের বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রচারের মধ্যে বসেও মুসলমান সাহিত্যিকগণ মনে করতেন হিন্দু-মুসলমানের মিলনই সমগ্রভাবে দেশের ও জাতির উন্নতির একমাত্র উপায়। মুসলমানদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চ্চায় অনগ্রসরতাকে তাঁরা এ মিলনের অন্যতম প্রধান অন্তরায় মনে করতেন। কাজেই নিজের সমাজকে বাংলা ভাষা চর্চ্চার জন্য নানাভাবে তাঁরা উদ্বুদ্ধ করেছেন। মশাররফ হোসেন বলেছেন; 'মাতৃভাষায় যাহার আস্থা নাই, সে মানুষ নহে।' ডাক্তার মহম্মদ মীর আলী তাঁর 'এখন কর্ত্তব্য কি?' প্রবন্ধে বলেছেন, 'মাতৃ-ভাষাবলম্বিত সাহিত্যই সামাজিক ও স্বদেশ উন্নতির প্রশস্ত উপায়।' এবং একথা বুঝতেন বলেই নুর-অল-ইমান সমাজের লোকেরা বাংলা ভাষায় মাসিকপত্র প্রকাশ

করেছিলেন যদিও তাঁরা জানতেন, "যাঁহারা ইংরেজী জানেন, তাঁহারা দেশী ভাষায় কাগজ পরিতে নারাজ। যাঁহারা আরবী পারসী এলেমে সুপণ্ডিত, তাঁহারা বাঙ্গালাকে একটা ভাষাই বলেন না। বাঙ্গালা কাগজ পড়া দূরে থাকুক, বাঙ্গালাতে বাক্যালাপ করাকেও ঘৃণাবোধ করেন।" (নুর-অল-ইমান, আষাঢ়, ১৩০৭)

মুসলমানদের বাংলা চর্চ্চার আহ্বান দিতে গিয়ে তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন, 'বঙ্গ বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের একদেশতা'। এ সম্পর্কে ডাক্তার মহম্মদ মীর আলী তাঁর 'এখন কর্ত্তব্য কি?' প্রবন্ধে বলেছেন: "ন্যায়ত দেখিতে গেলে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়সমূহ উভয় জাতির, সুতরাং শিক্ষাও উভয় ভাবাপন্ন হওয়া সমীচীন। কিন্তু তাহা ঘটিতেছে না। পুস্তকগুলি কেবলই হিন্দু লিখিত ও হিন্দু ভাবাপন্ন; দোষ কাহার? মুসলমানেরই। তাঁহারা বাংলা গ্রন্থ লিখিতে অপারগ। হিন্দু ভ্রাতারা যাহা লিখিয়া দেন, মুসলমানেরা অম্লান বদনে তাহাই অধ্যয়ন করেন। ঐ সকল গ্রন্থ প্রায়ই এরূপভাবে লিখিত যে, পাঠ করিলে, ভারতে হিন্দু ব্যতীত মুসলমানদের বিদ্যমানতাই আদৌ উপলব্ধি হয়না। অহো! এ ক্ষেত্রে কতিপয় অপরিণামদর্শী হিন্দু গ্রন্থকার যে বিষম অনর্থ ঘটাইয়াছেন, তাহা প্রক্ষালন করিতে অধিক সময়পেক্ষা করিবে। কোন কোন গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থে মুসলমানদের তিল দোষকে তাল দোষরূপে দেখাইয়াছেন। হিন্দুর তাল দোষকে তিল দোষরূপে বর্ণনা বা গোপন করিতেই প্রয়াস পাইয়াছেন। আবার গ্রন্থান্তরে মুসলমানকে একেবারে ঘৃণা মিশ্রিত হাস্যজনক "বহুরূপী" রূপে সাজাইয়া পাঠকগণের সম্মুখে দণ্ডায়মান করাইয়াছেন। কোন কোন স্থলে কোন কোন গ্রন্থকার অতিরিক্ত আরোপ সূত্রে বর্ণিত "নীচাশয়," "নির্দ্দয়," "ম্লেচ্ছ" ও "যবন" প্রভৃতি সুমধুর আখ্যায় 'বোবাধন' মুসলমানকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, এইরূপ দ্বেষ, ক্রোধ ও ঘৃণাব্যঞ্জক ভাব প্রারম্ভ হইতেই পাঠার্থী হিন্দু বালকগণের অস্থিমজ্জায় বিজড়িত হইতে আরম্ভ হয়। পক্ষান্তরে মুসলমান বালকগণ স্ব সম্প্রদায়ের ঈদৃশ নিকৃষ্টভাব হৃদয়ঙ্গম করতঃ নিষ্প্রভাচরণ অবলম্বন করিয়া থাকে। এ স্থলে হিন্দু ভ্রাতাগণের ধীরতা আবশ্যক।"

পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে মুসলমানদের অভিযোগ যে সত্য ছিল তার আভাষ দীনেশচন্দ্র সেনের উক্তিতেও পাওয়া যায়। ১৩১০ সালের ৪ঠা অগ্রহায়ণের 'মিহির ও সুধাকরে' তিনি 'মাতৃভাষা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে লেখেন, "মুসলমান, হিন্দু সাহিত্য পাঠে, হিন্দু আচার ব্যবহার শিক্ষায় ক্রমেই হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িবে; তাই বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকা মুসলমানদের উচিৎ নহে।"

মুসলমান সাহিত্যিকরা কতকটা এ তাগিদ থেকেই মুসলমানী বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। আর মুসলমানী সাহিত্য বলতে তাঁরা মনে করেছিলেন মুসলমানের ধর্ম্ম, ইতিহাস প্রভৃতিকে অবলম্বন করে রচিত সাহিত্য। ১৩১১ সালে প্রকাশিত "কাসেম বধ কাব্যে'র ভূমিকায় গ্রন্থকার হামিদ আলী লিখেছেন, "আমার এই কাব্য প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য, মুসলমান গ্র্যাজুয়েট (graduate) দিগকে সাহিত্য ক্ষেত্রে আহ্বান, পুস্তক প্রণয়নের দিকে পথ প্রদর্শন এ বিষয়ে তাঁহাদের ঔদাসীন্যের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ। নতুবা আমার মত দীনের কাব্য প্রকাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র।"

সেদিনের মুসলমান শিক্ষিত সমাজ বাংলা ভাষাকে নিজের প্রাণের প্রিয় ভাষা মনে করে, তার মাধ্যমে স্বীয় সমাজকে জাগ্রত করার যে সুবিপুল প্রয়াস পেয়েছিলেন, তারই স্বাক্ষর আছে ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয় দশকের সাহিত্য পত্রিকাগুলোতে। যে কোন জাতির নবজাগরণের একটা প্রধান লক্ষণ হোল আত্মমর্য্যাদাবোধ। ঊনিশ শতকের নবজাগ্রত মুসলমান সমাজেও প্রবল আত্মমর্য্যাদাবোধ দেখা দিয়েছিল। এবং সে মর্য্যাদাকে তাঁরা ক্ষুণ্ণ হতে দেখেছিলেন হিন্দুর সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে। ফলে তাঁরা শুধু একক বিচ্ছিন্নভাবেই নয়, সমবেতভাবেও হিন্দু সমাজের কাছে 'বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমান বিদ্বেষের বিরুদ্ধে' প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ১৮৯৮ সালে কলকাতায় সারা ভারত মুসলিম শিক্ষা সমিতির অধিবেশনে নবাব আলী চৌধুরীর প্রস্তাবটি সে সাক্ষ্যই বহন করে। মুসলমানরা সে প্রস্তাবটি হিন্দু সম্পাদকদের কাছে পাঠিয়েছিলেন সহৃদয় আলোচনার জন্য। তাঁরা চেয়েছিলেন উন্নত এবং সমৃদ্ধ প্রতিবেশীর কাছে উদারতা ও সহানুভূতি। কিন্তু তাঁদের সে প্রত্যাশা নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে

ইসমাইল হোসেন সিরাজী তাঁর 'মুসলমান জাতি ও হিন্দু লেখক' প্রবন্ধে লিখেছেন, "উহা যে একটি ভাবিবার এবং বিবেচনার বিষয় তাহাও তাঁহাদের গর্ব্বোন্নত মস্তকে কদাপি ধারণাও হয় নাই। অনেকে তাচ্ছিল্য করিয়া একবার খুলিয়াও দেখেন নাই।"

হিন্দু সাহিত্যিকদের আঘাত ও হিন্দু সমাজের অবহেলা মুসলমানদের চিত্তের বেদনাকে ক্রমেই পুঞ্জীভূত করে তুলেছিল। পরবর্ত্তীকালে এস, এম, আকবর উদ্দীন, বি, এ 'আল-এসলাম' পত্রিকায় 'বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের স্থান' শীর্ষক একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণা প্রতাপ', 'নূরজাহান' ও 'দুর্গাদাস' নাটক, প্রফুল্ল কুমার বসুর 'রোশেনা' নাটক এবং অন্যান্য মুসলিম কুৎসামূলক হিন্দু রচনার পরিচয় দিয়ে যে কথা বলেছেন তা সেদিনের মুসলমানচিত্তের প্রতিক্রিয়াকেই প্রকাশ করেছে। হিন্দু সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, "আমাদের যাহা মহৎ, যাহা সুন্দর, যাহা উৎকৃষ্ট, তাহা পতিত, হেয়, ঘৃণ্যভাবে চিত্রিত করিলে আমাদের অন্তরে যে নিদারুণ আঘাত লাগে, তাহাতে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না।" (পৌষ, ১৩২৩ সাল)। এ আঘাত থেকে উৎসারিত হয় যে প্রশ্ন তাকেই তিনি প্রবন্ধের উপসংহারে তুলে ধরেছেন, "বাঙ্গালীর nationality প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, বাঙ্গালীর গৌরব বর্দ্ধিত করিতে হইলে, কেবল হিন্দুদের ভিতর জাতীয় প্রেরণা দিলেই চলিবে না। মুসলমানের প্রাণের ভাবের তারে ঝঙ্কার দিতে হইবে, তাহাদের মনপ্রাণ মাতাইয়া তুলিতে হইবে। তাহা না করিয়া তোমরা, হিন্দু লেখকগণ, কেবল নিজের টুকুই বোঝ, নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত থাক এবং সেই সঙ্গে আমাদিগকে উপর হইতে বলপূর্ব্বক টানিয়া নীচে নামাইয়া দাও। কেন?" (মাঘ, ১৩২৩)। এ "কেন" র জবাবই হয়ত মুসলমানেরা সন্ধান করেছিলেন স্বতন্ত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কিন্তু সে আর এক প্রসঙ্গ। *

---

*আমার এ প্রবন্ধ রচনার উপাদান হিসেবে বিভিন্ন পুরানো ও দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকা দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ইদরিস আলী সাহেব, সৈয়দ মর্তজা আলী সাহেব, সৈয়দ আসাদ উদ্‌দৌলা সিরাজী সাহেব এবং রাজশাহীর মির্জ্জা আবদুল আজিজ সাহেব। তাঁদের আন্তরিক সাহায্য ও সহানুভূতি আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।